سورة الممتحنة

সূরা মুমতাহিনা

মদীনায় অবতীর্ণ, ১৩ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ
اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ
الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا
فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ
بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ
السَّبِيْلِ ۝١ اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ
اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۝٢ لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ
وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٣
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا
لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا
بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا
بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ
لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ
الْمَصِيْرُ ۝٤ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ

إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহর নামে শুরু

(১) হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (২) তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফির হয়ে যাও। (৩) তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (৪) তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সংগীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেন: আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্য আল্লাহ্র কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। (৫) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬) তোমরা যারা আল্লাহ্ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ বেপরোয়া, প্রশংসার মালিক।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (অর্থাৎ আন্তরিক বন্ধুত্ব না হলেও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারও করো না)। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে তা অস্বীকার করে।

(এতে বোঝা যায় যে, তারা আল্লাহ্‌র শত্রু)। তারা রাসূল (সা)-কে ও তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। (এতে বোঝা যায় যে, তারা কেবল আল্লাহ্‌রই শত্রু নয়---তোমাদেরও শত্রু। মোটকথা, এদের সাথে বন্ধুত্ব করো না)। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য ও আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য (নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে) বের হয়ে থাক, তবে (কাফিরদের বন্ধুত্বের জন্য যার সারমর্ম কাফিরদের সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর উপযুক্ত কাজকর্মের পরিপন্থী) কেন তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্বের কথাবার্তা বলছ ? (অর্থাৎ প্রথমত বন্ধুত্বই মন্দ, এরপর গোপন বার্তা প্রেরণ করা যা বিশেষ সম্পর্কের পরিচায়ক, তা আরও মন্দ)। অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। (অর্থাৎ উপরোক্ত বাধা-সমূহের অনুরূপ 'আমি সব জানি' এটাও তাদের বন্ধুত্বের পথে বাধা হওয়া উচিত। অতঃপর এর জন্য শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছেঃ) তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (আর বিচ্যুতদের পরিণাম তো জানাই আছে। তারা তো তোমাদের এমন শত্রু যে) তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা (তৎক্ষণাৎ) শত্রুতা প্রকাশ করতে থাকে এবং (সেই শত্রুতা প্রকাশ এই যে,) মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করে (এটা পার্থিব ক্ষতি) এবং (ধর্মীয় ক্ষতি এই যে,) এরা চায় যে, তোমরা কাফিরই হয়ে যাও। (সুতরাং এরূপ লোক বন্ধুত্বের যোগ্য নয়। বন্ধুত্বের ব্যাপারে যদি তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা কর, তবে খুব বুঝে নাও,) তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন তোমাদের (কোন) উপকারে আসবে না। তিনিই তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। [সুতরাং প্রত্যেক কর্মের সঠিক ফয়সালা করবেন। তোমাদের কর্ম শাস্তির কারণ হলে সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন এই শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। এমতাবস্থায় তাদের খাতিরে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করা খুবই গর্হিত কাজ। এ থেকে আরও স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, ধনসম্পদ খাতির করার যোগ্য নয়। অতঃপর উল্লিখিত আদেশ পালনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনার অবতারণা করা হচ্ছেঃ] তোমাদের জন্য ইবরাহীম (আ) ও তাঁর (ঈমান ও আনুগত্যে) সমমনাদের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। [অর্থাৎ এ ব্যাপারে কাফিরদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা উচিত, যেরূপ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারিগণ করেছেন]। তারা (বিভিন্ন সময়ে) তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমাদের সাথে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ['বিভিন্ন সময়ে' বলার কারণ এই যে, ইবরাহীম (আ) যখন প্রথমবার সম্প্রদায়কে একথা বলেছিলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ একা ছিলেন। এরপর যে-ই তাঁর অনুসরণ করেছে, সে-ই কাফিরদের সাথে কথায় ও কাজে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। অতঃপর এই সম্পর্কচ্ছেদের রূপরেখা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ] আমরা তোমাদেরকে (অর্থাৎ কাফির ও তাদের উপাস্যদেরকে) মানি না (অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাস ও উপাস্যদের ইবাদত মানি না। এরপর লেনদেন ও ব্যবহারের দিক দিয়ে সম্পর্কচ্ছেদ এই যে) আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে চিরন্তন শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে (কেননা, শত্রুতার ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাসগত বিরোধ। এখন এটা বেশী ফুটে উঠার কারণে শত্রুতাও ফুটে উঠেছে। এই শত্রুতা চিরকাল থাকবে) যে পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর।

[মোটকথা, ইবরাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারিগণ কাফিরদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কছেদ করলেন]। কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে, (এই আদর্শের ব্যতিক্রম। এতে বাহ্যত কাফিরদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব বোঝা যাচ্ছিল)। তিনি বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্য (ক্ষমা প্রার্থনার বেশী) আল্লা-হ্‌র কাছে আমার কিছু করার নেই। [অর্থাৎ দোয়া কবুল করাতে পারি না অথবা বিশ্বাস স্থাপন না করা সত্ত্বেও তোমাকে আযাব থেকে রক্ষা করব, তা পারি না। উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আ) এর এতটুকু কথার অর্থ কেউ কেউ এরূপ বুঝে নিয়েছে যে, এটা ক্ষমা প্রার্থনাই। অথচ এখানে ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ অন্যরূপ। অর্থাৎ পিতার জন্য এরূপ দোয়া করা যে, সে বিশ্বাস স্থাপন করে ক্ষমার যোগ্য হয়ে থাকে। সবাই এরূপ করতে পারে। বাস্তবে এটা সম্পর্ক-ছেদের পরিপন্থী নয়। কিন্তু দৃশ্যত এতে সম্পর্ক স্থাপন ও ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ থাকায় একে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সম্প্রদায়ের সাথে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথাবার্তা বর্ণিত হল। অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে দোয়ার বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ কাফিরদের সাথে সম্পর্কছেদ করে তিনি এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে আরয করলেন ঃ] হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা (কাফিরদের সাথে সম্পর্কছেদ ও শত্রুতা ঘোষণা করার ব্যাপারে) আপনার উপর ভরসা করেছি এবং (আপনিই আমাদেরকে সকল বিপদাপদ ও শত্রুদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করবেন। এছাড়া বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে) আপনার দিকেই মুখ করেছি। (আমাদের বিশ্বাস এই যে) আপনারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। সুতরাং এই বিশ্বাসের কারণে আমরা আন্তরিকতার সাথে কাফিরদের সাথে সম্পর্কছেদ করেছি। এতে কোন পার্থিব স্বার্থ নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র করবেন না। (অর্থাৎ এই সম্পর্কছেদের কারণে কাফিররা যেন আমাদের উপর জুলুম করতে না পারে)। হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদের পাপ মার্জনা করুন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের জন্য অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার) এবং কিয়ামতের (আগমনের) বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য তাঁদের মধ্যে [অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে] উত্তম আদর্শ রয়েছে। যে ব্যক্তি (এই আদেশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে তার নিজের ক্ষতি করে, কেননা) আল্লাহ্‌ বেপরোয়া (এবং পূর্ণতাগুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে) প্রশংসার্হ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরার শুরুভাগে কাফির ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল ঃ তফসীর কুরতুবীতে কুশায়রী ও সা'লাবীর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কার সারা নাম্নী একজন গায়িকা নারী প্রথমে মদীনায় আগমন করে। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বলল ঃ না। আবার জিজ্ঞাসা করা হল ঃ তবে কি তুমি মুসলমান হয়ে এসেছ? সে এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন ঃ তা হলে কি উদ্দেশ্যে

আগমন করেছ? সে বলল ঃ আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে। আমি ঘোর বিপদে পড়ে ও অভাবগ্রস্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই যুবকরা কোথায় গেল, যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা-পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করে? সে বলল ঃ বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসবপর্ব ও গান-বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকগণকে তাকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কার কাফিররা হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বাহ্নে মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোক। এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতেব ইবনে আবী বালতায়া (রা)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভূত এবং মক্কায় এসে বসবাস অবলম্বন করেছিলেন। মক্কায় তাঁর স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানগণও মক্কায় ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও অনেক সাহাবীর হিজ-রতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাফিররা নির্যাতন চালাত এবং তাদেরকে উত্ত্যক্ত করত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা কোন-রূপে নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তাঁর সন্তান-সন্ততিকে শত্রুর নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তাঁর সন্তানদের উপর জুলুম করবে না। তাই গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করলেন।

হাতেব স্বস্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তাঁর কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফিরদেরকে জানিয়ে দিই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তোমা-দের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলেপেলেদের হিফা-যত হয়ে যাবে। সুতরাং হাতেব এই ভুলটি করে ফেললেন এবং মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে গায়িকা সারার হাতে সোপর্দ করলেন।---(কুরতুবী, মাযহারী)

এদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এ সময়ে রওযায়ে খাক নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে, আবূ মুরসাদকে ও যুবায়র ইবনে আওয়ামকে আদেশ দিলেন ঃ অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চাদ্ধাবন কর। তোমরা তাকে রওযায়ে খাকে পাবে। তার সাথে মক্কাবাসীদের

নামে হাতেব ইবনে আবী বালতায়ার পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে আস। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আমরা নির্দেশমত দ্রুতগতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা) যে স্থানের কথা বলেছিলেন, ঠিক সে স্থানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম, পত্রটি বের কর। সে বলল ঃ আমার কাছে কারও কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর তালাশ করে কোন চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে বললাম, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সংবাদ ভ্রান্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললাম ঃ হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে দেব।

অগত্যা সে নিরুপায় হয়ে পায়জামার ভেতর থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে চলে এলাম। হযরত উমর (রা) ঘটনা শুনা মাত্রই ক্রোধে অগ্নি-শর্মা হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলেন ঃ এই ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও সকল মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাফিরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।

রসূলুল্লাহ্ (সা) হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাকে এই কাণ্ড করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতেব আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ঈমানে এখনও কোন তফাত হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার বাচ্চা-কাচ্চাদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি ব্যতীত অন্য কোন মুহাজির এরূপ নেই, যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যমান নেই। তাদের স্বগোত্রীয়রা তাদের পরিবার-পরিজনের হিফাযত করে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) হাতেবের জবানবন্দি শুনে বললেন ঃ সে সত্য বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। হযরত উমর (রা) ঈমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাঁকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ্ তা'আলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও তাদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত উমর (রা) অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরয করলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই আসল সত্য জানেন।---(ইবনে কাসীর) কোন কোন রেওয়ায়েতে হাতেবের এই উক্তিও বর্ণিত আছে যে, আমি এ কাজ ইসলাম ও মুসলমান-দের ক্ষতি করার জন্য করিনি। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-ই বিজয়ী হবেন। মক্কাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুম্‌তাহিনার শুরুভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে উপরোক্ত ঘটনার জন্য হুঁশিয়ার করা হয় এবং কাফিরদের সাথে মুসলমান-দের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ —— অর্থাৎ মু'মিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের

শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না যে, তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করবে। এতে উল্লিখিত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের পত্র কাফিরদের কাছে লিখা বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করারই নামান্তর। আয়াতে 'কাফির' শব্দ বাদ দিয়ে 'আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রু' বলে প্রথমত এই নির্দেশের কারণ ও দলীল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহ্‌র শত্রুর কাছে বন্ধুত্ব আশা করা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ নয়। অতএব এ থেকে বিরত থাক। দ্বিতীয়ত এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফির যে পর্যন্ত কাফির থাকবে, সে কোন মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। সে আল্লাহ্‌র দুশমন। অতএব যে মুসলমান আল্লাহ্‌র মহব্বত দাবী করে, তার সাথে কাফিরের বন্ধুত্ব কিরূপে সম্ভবপর ?

وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ

تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ—এখানে حق বলে কোরআন অথবা ইসলাম বোঝানো হয়েছে। এই আয়াতে তাদের শত্রুতার আসল কারণ কুফর বর্ণনা করার পর তাদের বাহ্যিক শত্রুতাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের রসূলকে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছে। এই বহিষ্কারের কারণ কোন পার্থিব বিষয় নয়। বরং একমাত্র তোমাদের ঈমানই এর কারণ ছিল। অতএব এ কথা আর গোপন রইল না যে, তোমরা যে পর্যন্ত মু'মিন থাকবে তারা তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। হাতেব মনে করেছিল যে, তাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করলে তারা তার পরিবার-পরিজনের হিফাযত করবে। তার এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, ঈমানের কারণে তারা তোমাদের শত্রু। আল্লাহ্ না করুন, তোমাদের ঈমান বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বন্ধুত্বের আশা করা ধোঁকা বৈ নয়।

اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের হিজরত যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র জন্য ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ছিল, তবে আল্লাহ্‌র শত্রু কাফিরদের কাছে এই আশা কিরূপে রাখা যায় যে, তারা তোমাদের খাতির করবে ?

تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ

এতে আরও বলা হয়েছে যে, যারা কাফিরদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব রাখে তারা যেন মনে না করে যে, তাদের এই কার্যকলাপ গোপন থেকে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কাজকর্মের খবর রাখেন ; যেমন উল্লিখিত ঘটনায় তিনি তাঁর রসূলকে ওহীর মাধ্যমে অবগত করে চক্রান্ত ধরিয়ে দিয়েছেন।

إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ

بِالسُّوءِ—অর্থাৎ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তোমাদের সাথে উদার ব্যবহার করবে, তাদের কাছে এরূপ প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। তারা যখনই তোমাদের উপর প্রাধান্য হাসিল করবে, তখনই তাদের বাহু ও রসনা তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া কোন দিকে প্রসারিত হবে না।

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ—এতে ইঙ্গিত আছে যে, যখন তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে, তখন তাদের বন্ধুত্ব কেবল তোমাদের ঈমানের বিনিময়ে লাভ করতে পারবে। তোমরা কুফরে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়তা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপকারে আসবে না। আল্লাহ্ তা'আলা সেদিন এসব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবেন। সন্তানরা পিতামাতার কাছ থেকে ও পিতামাতারা সন্তানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এতে হযরত হাতেবের ওযর খণ্ডন করা হয়েছে যে, যে সন্তানদের মহব্বতে তুমি এ কাজ করেছিলে, মনে রেখ, কিয়ামতের দিন তারা তোমার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ্র কাছে কোন কিছু গোপন নয়।

পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের সাথে সম্পর্কছেদের সমর্থনে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সমস্ত জ্ঞাতিগোষ্ঠী মুশরিক ছিল। তিনি সবার সাথে শুধু সম্পর্কছেদই নয়--শত্রুতাও ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ যে পর্যন্ত তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করবে এবং শিরক থেকে বিরত না হবে, সেই পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতার প্রাচীর অন্তরায় হয়ে থাকবে।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ থেকে حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

একটি সন্দেহের জওয়াব ঃ উপরের আয়াতে মুসলমানদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উত্তম আদর্শ ও সুন্নত অনুসরণ করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইবরাহীম (আ) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন বলেও প্রমাণিত আছে। সূরা তওবায় এর

উল্লেখ আছে। অতএব সন্দেহ হতে পারত যে, মুশরিক পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করা ইবরাহিমী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা জায়েয হওয়া উচিত। তাই ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ থেকে একে ব্যতিক্রম প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অন্য সব বিষয়ে ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ জরুরী কিন্তু তাঁর এই কাজটির অনুসরণ মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়। إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ আয়াতের মর্ম তাই।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ওযর সূরা তওবায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পিতার জন্য মাগ-ফিরাতের দোয়া নিষেধাজ্ঞার পূর্বে করেছিলেন, অথবা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে করেছিলেন যে, তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু পরে যখন জানলেন যে, সে আল্লাহ্‌র দুশমন, তখন এ বিষয় থেকে নিজের বিমুখতা ঘোষণা করলেন। فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

কোন কোন তফসীরবিদ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ-কে বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, ইবরাহীম (আ) যে পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে-ছিলেন, এটা তাঁর আদর্শের পরিপন্থী নয়। কেননা, তিনি পিতা মুসলমান হয়ে গেছে ---এই ধারণার বশবর্তী হয়ে দোয়া করেছিলেন। এরপর যখন তিনি আসল সত্য জানতে পারেন, তখন দোয়া ছেড়ে দেন এবং সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। এরূপ করা এখনও জায়েয। কোন কাফির সম্পর্কে যদি কারও প্রবল ধারণা থাকে যে, সে মুসলমান, তবে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করায় কোন দোষ নেই।---(কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই অবলম্বিত হয়েছে।

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ
وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَا
تِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ
تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ
عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ

ظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۝

(৭) যারা তোমাদের শত্রু, আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবত বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ্ সবই করতে পারেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৮) ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। (৯) আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালিম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যেহেতু কাফিরদের শত্রুতার কথা শুনে মুসলমানরা চিন্তান্বিত হতে পারত এবং সম্পর্কচ্ছেদের কারণে স্বভাবত তাদের মনে দুঃখ লাগতে পারত, তাই সুসংবাদের ভঙ্গিতে অতঃপর ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে যে) যারা তোমাদের শত্রু, সম্ভবত (অর্থাৎ ওয়াদা এই যে) আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন (যদিও কিছু সংখ্যকের সাথে অর্থাৎ তাদেরকে মুসলমান করে দেবেন। ফলে শত্রুতা বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়ে যাবে)। এবং (একে অসম্ভব মনে করো না। কেননা) আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। (সেমতে মক্কা বিজয়ের দিন অনেকেই মুসলমান হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্কচ্ছেদ চিরকালের জন্য হলেও তা আদিষ্ট বিষয় হওয়ার কারণে অবশ্য পালনীয় ছিল। কিন্তু যখন তা স্বল্পকালের জন্য এবং মুসলমান হওয়ার ফলে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, তখন চিন্তান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এ পর্যন্ত কেউ যদি এই আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে এবং পরে তওবা করে থাকে তবে) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (এ পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অতঃপর অনুগ্রহমূলক সম্পর্ক রাখার বিবরণ দেওয়া হচ্ছেঃ) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে সদাচরণ ও ইনসাফ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন না, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি। (এখানে যিম্মী অথবা শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ কাফিরদেরকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণ জায়েয। অবশ্য ন্যায় ও সুবিচারের জন্য যিম্মী ও চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া শর্ত নয়। এটা প্রত্যেক কাফির এমনকি জন্তু-জানোয়ারের সাথেও ওয়াজিব। কিন্তু আয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ বলে অনুগ্রহমূলক ব্যবহার বোঝানো হয়েছে। তাই বিশেষভাবে যিম্মী ও চুক্তিতে আবদ্ধ কাফিরের মধ্যেই সীমিত রাখা হয়েছে)। আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। (অবশ্য)

আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব (ও অনুগ্রহ) করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, (কার্যক্ষেত্রে অথবা ইচ্ছার মাধ্যমে) তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং (বহিষ্কৃত না করলেও) বহিষ্কার-কার্যে (বহিষ্কারকারীদেরকে) সাহায্য করেছে। অর্থাৎ তাদের সাথে শরীক রয়েছে, কার্যত কিংবা বহিষ্কার করার ইচ্ছার মাধ্যমে। যেসব কাফিরের সাথে মুসলমানদের শান্তিচুক্তি অথবা বশ্যতা স্বীকারের বন্ধন ছিল না, তারা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সাথে অনুগ্রহ-মূলক কাজ-কারবার জায়েয নয়; (বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই কাম্য)। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব (অর্থাৎ অনুগ্রহমূলক ব্যবহার) করবে, তারাই পাপিষ্ঠ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে; যদিও সেই কাফির আত্মীয়তায় খুবই নিকটবর্তী হয়। সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলী পালনের ব্যাপারে নিজেদের খাহেশ ও আত্মীয়-স্বজনের পরোয়া করতেন না। তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞাও বাস্তবায়িত করলেন। ফলে দেখা গেল যে, ঘরে ঘরে পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। বলা বাহুল্য, মানবপ্রকৃতি ও স্বভাবের জন্য এ কাজ সহজ ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াত-সমূহে আল্লাহ্ তা'আলা এই সংকটকে অতিসত্বর দূর করার আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন।

কোন কোন হাদীসে আছে, আল্লাহ্র কোন বান্দা যখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের কোন প্রিয় বস্তুকে বিসর্জন দেয়, তখন প্রায়ই আল্লাহ্ তা'আলা সেই বস্তুকেই হালাল করে তার কাছে পেঁৗছিয়ে দেন এবং অনেক সময় এর চাইতেও উত্তম বস্তু প্রদান করেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, আজ যারা কাফির, ফলে তারা তোমাদের শত্রু ও তোমরা তাদের শত্রু, সত্বরই হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা এই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পর্যবসিত করে দেবেন অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের তওফীক দিয়ে তোমাদের পারস্পরিক সুসম্পর্ককে নতুন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী মক্কা বিজয়ের সময় বাস্তব রূপ লাভ করে। ফলে নিহতদের বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল কাফির মুসলমান হয়ে যায়।---(মাযহারী) কোরআন পাকের এক আয়াতে এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا অর্থাৎ তারা দলে দলে আল্লাহ্র দীন ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে; বাস্তবেও তাই হয়েছে।

বুখারী ও মসনদে আহ্‌মদের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা (রা)-র জননী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর স্ত্রী কবীলা হুদায়বিয়া সন্ধির পর কাফির অবস্থায় মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছেন। তিনি কন্যা আসমার জন্য কিছু উপঢৌকনও সাথে নিয়ে যান। কিন্তু হযরত আসমা (রা) সেই উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে জিজ্ঞাসা করলেন : আমার জননী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন,

কিন্তু তিনি কাফির। আমি তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করব? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন: জননীর সাথে সদ্ব্যবহার কর। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা (রা)-র জননী কবীলাকে হযরত আবূ বকর (রা) ইসলাম পূর্বকালেই তালাক দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর অপর স্ত্রী উম্মে রোমানের গর্ভজাত ছিলেন। উম্মে রোমান মুসলমান হয়ে যান।---(ইবনে কাসীর, মাযহারী)

যেসব কাফির মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কারেও অংশগ্রহণ করেনি, আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার তো প্রত্যেক কাফিরের সাথেও জরুরী। এতে যিম্মী কাফির, চুক্তিতে আবদ্ধ কাফির এবং শত্রু কাফির সবই সমান বরং ইসলামে জন্তু-জানোয়ারের সাথেও সুবিচার করা ওয়াজিব অর্থাৎ তাদের পৃষ্ঠে সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না এবং ঘাস-পানি ও বিশ্রামের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

মাস'আলা: এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নফল দান-খয়রাত যিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ কাফিরকেও দেওয়া যায়। কেবল শত্রুদেশের কাফিরকে দেওয়া নিষিদ্ধ।

اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ—এই আয়াতে সেই সব কাফিরের বর্ণনা আছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে এবং মুসলমানদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কারে অংশগ্রহণ করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন। এতে অনুগ্রহমূলক কাজ-কারবার করতে নিষেধ করা হয়নি; বরং শুধু আন্তরিক বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ কেবল যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেই নয়; বরং যিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের সাথেও জায়েয নয়। এ থেকে তফসীরে-মাযহারীতে মাস'আলা বের করা হয়েছে যে, যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে ন্যায় ও সুবিচার করা তো জরুরীই; নিষিদ্ধ নয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেও জায়েয। তবে অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে এর জন্য শর্ত এই যে, তাদের সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহারের কারণে মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতি হওয়ার আশংকা যেন না থাকে। আশংকা থাকলে জায়েয নয়। তবে ন্যায় ও সুবিচার প্রত্যেকের সাথে সর্বাবস্থায় জরুরী ও ওয়াজিব।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى

الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ
ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِن فَاتَكُمْ
شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَا
جُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ
فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ
الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

(১০) হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররা এদের জন্য হালাল নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহ্র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১১) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফির-দের কাছে থেকে যায়, অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও, তখন যাদের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার

প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (১২) হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (১৩) হে মু'মিনগণ ! আল্লাহ্ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন কবরস্থ কাফিররা নিরাশ হয়ে গেছে।

শানে-নুযূলের ঘটনা ঃ আলোচ্য আয়াতগুলোও একটি বিশেষ ঘটনা অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সূরা ফাত্‌হ-এর শুরুতে এই সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সন্ধির যেসব শর্ত ছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি কাফিরদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। পরন্তু কাফিরদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দিতে হবে। সেমতে কিছু মুসলমান পুরুষ কাফিরদের মধ্য থেকে আগমন করে এবং তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর কয়েকজন নারী মুসলমান হয়ে আগমন করে। তাদের কাফির আত্মীয়রা তাদেরকে প্রত্যর্পণের আবেদন জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলো হুদায়বিয়ায় অবতীর্ণ হয়। এতে নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সন্ধিপত্রের ব্যাপকতা সংকুচিত ও রহিত হয়ে গেছে। এ ধরনের নারীদের ব্যাপারে কিছু বিশেষ বিধানও নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর সাথে এমন নারীদের ব্যাপারেও কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে, যারা প্রথমে মুসলমানদের সাথে বিবাহিতা ছিল ; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং মক্কাতেই থেকে যায়। মুসলমান হওয়াই এই নারীদের বেলায় আসল ভিত্তি বিধায় তাদের ঈমান পরীক্ষা করার পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ ! যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা (দারুল-হরব থেকে) হিজরত করে আগমন করে, [দারুল-ইসলাম মদীনায় আসুক কিংবা দারুল-ইসলামের পর্যায়ভুক্ত হুদায়বিয়ার সেনা ছাউনিতে আসুক---(হিদায়া)] তখন তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও (যে, সত্যিই মুসলমান কিনা। পরবর্তী يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ আয়াতে এই পরীক্ষার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বাহ্যিক পরীক্ষাকেই যথেষ্ট মনে কর। কেননা) তাদের (সত্যিকার) ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন। (তোমরা প্রকৃত অবস্থা জানতেই পার না)। যদি তোমরা (এই পরীক্ষার আলোকে) জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। (কেননা) তারা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররা তাদের জন্য হালাল নয়। (কারণ, মুসলমান নারীর বিবাহ কাফির

পুরুষের সাথে কোন অবস্থাতেই বজায় থাকে না। এমতাবস্থায়) কাফিররা (মোহরানা বাবদ তাদের পেছনে) যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে দিয়ে দাও। তোমরা এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। (মুসলমানগণ) তোমরা কাফির নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখো না। (অর্থাৎ তোমাদের যেসব স্ত্রী শত্রুদেশে কাফির অবস্থায় রয়ে গেছে, তোমাদের সাথে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তাদের সম্পর্কের কোন চিহ্ন বাকী আছে বলে মনে করো না। এমতাবস্থায়) তোমরা (সেই নারীদের মোহরানা বাবদ) যা ব্যয় করেছ, তা (কাফিরদের কাছ থেকে) চেয়ে নাও এবং (এমনিভাবে) কাফিররাও চেয়ে নেবে যা (মোহরানা বাবদ) তারা ব্যয় করেছে। এটা (অর্থাৎ যা বলা হল) আল্লাহ্‌র বিধান। (এর অনুকরণ কর)। তিনি তোমাদের মধ্যে (এমনি উপযুক্ত) ফয়সালা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী উপযুক্ত বিধান নির্ধারণ করেন)। যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কাফি-রদের মধ্যে থেকে যাওয়ার কারণে (সম্পূর্ণই) তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় (অর্থাৎ তাকেও পাওয়া না যায়। এরপর কাফিরদেরকে) তোমাদের (পক্ষ থেকে মোহরানা দেওয়ার) সুযোগ হয় অর্থাৎ (কোন কাফিরের মোহরানা তোমাদের উপর পরিশোধযোগ্য হয়) তবে (তোমরা সেই মোহরানা কাফিরকে দিও না, বরং) যেসব মুসলমানের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের (স্ত্রীদের উপর) ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ (সেই পরিশোধযোগ্য মোহ-রানা থেকে) দিয়ে দাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (জরুরী বিধি-বিধানে ত্রুটি করো না। অতঃপর বিশেষ সম্বোধনে ঈমান পরীক্ষার পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) হে পয়গম্বর (সা)! মুসলমান নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না (মূর্খতা যুগে) কোন কোন নারী অপরের সন্তান এনে নিজ স্বামীর সন্তান বলে চালিয়ে দিত অথবা জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরসজাত সন্তান বলে দিত। এতে ব্যভিচারের গোনাহ্ তো আছেই; পরন্তু অপরের সন্তানকে স্বামীর সন্তান দাবী করার পাপও আছে। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত আছে।---(আবূ দাঊদ, নাসায়ী)। এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (উদ্দেশ্য এই যে, তারা যখন এসব বিধানকে সত্য এবং অবশ্য পালনীয় মনে করার বিষয় প্রকাশ করে, তখন তাদেরকে মুসলমান মনে করুন। স্বয়ং ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অতীত সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়, তবুও এখানে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ মাগফিরাতের লক্ষণ হাসিল করার জন্য অথবা এটা ঈমান কবূলের দোয়া, যদ্দ্বারা মাগফিরাত হাসিল হয়)। মু'মিনগণ, আল্লাহ্ যাদের প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে (-ও) বন্ধুত্ব করো না। (এখানে ইহুদী জাতিকে বোঝানো হয়েছে, যেমন সূরা মায়িদায় বলা হয়েছেঃ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ)

তারা পরকালের (কল্যাণ ও সওয়াবের) ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে ; যেমন কবরস্থ কাফিররা (পরকালের সওয়াব ও কল্যাণ থেকে) নিরাশ হয়ে গেছে। [যে কাফির মারা যায়, সে পরকাল প্রত্যক্ষ করে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা নিশ্চিতরূপে জেনে নেয়। সে বুঝতে পারে যে, তাকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না। ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও নবুয়ত-বিরোধীদের কাফির হওয়ার বিষয়টি খুব জানত; কিন্তু লজ্জা ও বিদ্বেষের কারণে তাঁর অনুসরণ করত না। কাজেই তারাও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত যে, তারা পরকালে মুক্তি পাবে না। অতএব তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা মোটেই জরুরী নয়। মদীনায় ইহুদীদের সংখ্যা বেশী ছিল এবং তারা দুষ্টও ছিল খুব বেশী। তাই এখানে বিশেষভাবে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির কতিপয় শর্ত বিশ্লেষণ ঃ সূরা ফাত্হ-তে হুদায়বিয়ার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এতে অবশেষে মক্কার কাফির ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে একটি দশ বছর মেয়াদী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির কতিপয় শর্ত এমন ছিল যে, এতে কাফিরদের কাছে মুসলমানদের মাথা নত করা ও বাহ্যিক পরাজয় মেনে নেওয়ার ভাব পরিস্ফুট ছিল। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এ ব্যাপারে একটা চাপা অসন্তোষ ও ক্ষোভের ভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র ইঙ্গিতে অনুভব করছিলেন যে, এই ক্ষণস্থায়ী পরাজয় অবশেষে চিরস্থায়ী প্রকাশ্য বিজয়েরই পূর্বাভাস হবে। তাই তিনি শর্তগুলো মেনে নেন এবং সাহাবায়ে কিরাম ও অতঃপর আর উচ্চবাচ্য করেন নি।

এই শান্তিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, মক্কা থেকে কোন ব্যক্তি মদীনায় চলে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন যদিও সে মুসলমান হয়। কিন্তু মদীনা থেকে কেউ মক্কায় চলে গেলে কোরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই বাহ্যত অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ কোন মুসলমান পুরুষ অথবা নারী মক্কা থেকে চলে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে ফেরত পাঠাবেন।

এই চুক্তি সম্পাদন শেষে রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হুদায়বিয়াতেই অবস্থানরত ছিলেন, তখন মুসলমানদের জন্য অগ্নিপরীক্ষাতুল্য একাধিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হযরত আবূ জন্দল (রা)-এর। কোরাইশরা তাঁকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। তিনি কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিল যে, চুক্তির শর্তানুযায়ী তাঁকে ফেরত পাঠানো উচিত, কিন্তু আমরা আমাদের একজন নির্যাতিত ভাইকে জালিমদের হাতে পুনরায় তুলে দেব—এটা কিরূপে সম্ভব ?

কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি শরীয়তের নীতিমালার হিফাযত ও তৎপ্রতি দৃঢ়তা এক ব্যক্তির কারণে বিসর্জন দিতে পারতেন না। এর সাথে সাথে তাঁর দূরদর্শী অন্তর্দৃষ্টি সত্বরই এই নির্যাতিতদের বিজয়ীসুলভ মুক্তিও যেন প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিল। স্বভাবগত কারণেই তিনিও আবূ জন্দল (রা)-কে ফেরত প্রত্যর্পণে দুঃখিত হয়ে থাকবেন, কিন্তু চুক্তি পালনের খাতিরে তাঁকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বিদায় করে দিলেন।

এর সাথে সাথেই দ্বিতীয় একটি ঘটনা সংঘটিত হল। মুসলমান সাঈদা বিনতে হারেস (রা) কাফির সায়ফী ইবনে আনসারের পত্নী ছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে সায়ফীর নাম মুসাফির মখযুমী বলা হয়েছে। তখন পর্যন্ত মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ছিল না। এই মুসলমান মহিলা মক্কা থেকে পালিয়ে হুদায়-বিয়ায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে স্বামীও হাযির। সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে দাবী জানাল যে, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে প্রত্যর্পণ করা হোক। কেননা, আপনি এই শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং চুক্তিপত্রের কালি এখনও শুকায়নি।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। এর পরিণতিতে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান নারী হিজরত করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছে গেলে তাকে কাফিরদের হাতে ফেরত দেওয়া হবে না---সে পূর্ব থেকেই মুসলমান হোক; যেমন উল্লিখিত সাঈদা অথবা হিজরতের সময় তার মুসলমানিত্ব প্রমাণিত হোক। তাকে ফেরত না দেওয়ার কারণ এই যে, সে তার কাফির স্বামীর জন্য হালাল নয়। তফসীরে কুরতুবীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এই ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

মোট কথা, উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতরণের ফলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, চুক্তিপত্রের উপরোক্ত শর্তটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয় যে, পুরুষ অথবা নারী যে কোন মুসলমান আগমন করুক, তাকে ফেরত দিতে হবে। বরং এই শর্তটি ব্যাপক, কেবল পুরুষ-দের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়---নারীদের ক্ষেত্রে নয়। নারীদের ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, যে নারী মুসলমান হয়ে হিজরত করে, তার কাফির স্বামী মোহরানার আকারে যা কিছু তার পেছনে ব্যয় করেছে, তা তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এসব আয়াতের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তিপত্রে উল্লিখিত এই শর্তের সঠিক মর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং তদনুযায়ী সাঈদা (রা)-কে কাফিরদের কাছে ফেরত প্রেরণে বিরত থাকেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম বিনতে ওতবা মক্কা থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়। তার পরিবারের লোকেরা শর্তের ভিত্তিতে তাকে ফেরত দানের দাবী জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ নাযিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম আমর ইবনে আস (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। স্বামী তখনও মুসলমান ছিল না। উম্মে কুলসুম ও তাঁর দুই ভাই মক্কা থেকে পলায়ন করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে চলে যান। সাথে সাথেই তাঁদেরকে ফেরত পাঠানোর দাবী উঠে। রসূলুল্লাহ্ (সা) শর্ত অনুযায়ী আম্মারা ও ওলীদ ভ্রাতৃদ্বয়কে ফেরত পাঠিয়ে দেন; কিন্তু উম্মে কুলসুমকে ফেরত দেন নি। তিনি বললেনঃ এই শর্ত পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়। এর পরি-প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্যায়নে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এমনি ধরনের আরও কয়েকজন নারীর ঘটনা রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য, এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলো ঘটনাই সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লিখিত শর্ত থেকে নারীদের ব্যতিক্রম চুক্তি ভঙ্গের শামিল নয়; বরং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে একটি শর্তের ব্যাখ্যা মাত্র ঃ কুরতুবীর উল্লিখিত রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, চুক্তির উপরোক্ত ধারার ভাষা যদিও ব্যাপক ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মতে তাতে নারীরা শামিল ছিল না। তাই তিনি হুদায়বিয়াতেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দেন এবং এরই সত্যায়নে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) শর্তটিকে ব্যাপক ভিত্তিতেই মেনে নিয়েছিলেন এবং তাতে নারীরাও শামিল ছিল। কিন্তু আলোচ্য আয়াত-সমূহ অবতরণের ফলে ব্যাপকতা রহিত হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) তখনই কাফির-দেরকে অবহিত করে দেন যে, মহিলারা এই শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। সেমতে তিনি কোন নারীকে ফেরত পাঠান নি। এ থেকে বোঝা গেল যে, এটা চুক্তির বরখেলাফ কাজ ছিল না এবং চুক্তি খতম করে দেওয়াও ছিল না; বরং একটি শর্তের ব্যাখ্যা ছিল মাত্র। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উদ্দেশ্য পূর্ব থেকেই এরূপ ছিল কিংবা আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি শর্ত-টিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে সীমিত রাখার জন্য প্রতিপক্ষকে বলে দিয়েছিলেন। সর্বাবস্থায় এই ব্যাখ্যার পরও চুক্তিপত্রটি উভয় পক্ষ বহাল রাখে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা বাস্তব রূপ লাভ করতে থাকে। এই শান্তিচুক্তির ফলশ্রুতিতেই রাস্তাঘাট বিপদমুক্ত হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) বিশ্বের রাজন্যবর্গের নামে পত্র লিখেন। এরই সুবাদে আবূ সুফিয়ানের কাফিলা নিশ্চিন্তে সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে। সেখানে সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে রাজদরবারে ডেকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করেন।

সারকথা এই যে, এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক। নারীরা এর অন্তর্ভুক্ত না থাকার বিষয়টি পূর্ব থেকেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টিতে ছিল কিংবা আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি নারীদেরকে শর্ত থেকে খারিজ করে দেন। উভয় অবস্থাতেই কাফির ও মুসলমান-দের মধ্যে এই চুক্তি এরপরও পূর্ণাঙ্গরূপে বলবৎ ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা পালিত হয়। কাজেই এই ব্যাখ্যাকে চুক্তিভঙ্গকরণ অথবা চুক্তি খতমকরণরূপে গণ্য করা যায় না। অতঃপর ভাষাদৃষ্টে আয়াতসমূহের অর্থ অনুধাবন করুন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ

أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ— আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নারীদের মুসলমান ও মু'মিন হওয়াই সন্ধির শর্ত থেকে তাদের ব্যতিক্রমভুক্ত হওয়ার কারণ। মক্কা থেকে মদীনায় আগমন-কারিণী নারীদের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনাও ছিল যে, তাদের কেউ ইসলাম ও ঈমানের খাতিরে নয়, বরং স্বামীর সাথে ঝগড়া করে অথবা মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে হিজরত করেছে। এরূপ নারী আল্লাহ্র কাছে এই শর্তের ব্যতিক্রম-ভুক্ত নয়; বরং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাকে ফেরত পাঠানো জরুরী। তাই মুসলমান-গণকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেসব নারী হিজরত করে মদীনায় আসে, তাদের ঈমান

পরীক্ষা করে নাও। এর সাথেই বলা হয়েছে ঃ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যিকার ও আসল ঈমানের সম্পর্ক তো অন্তরের সাথে, যার খবর আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। তবে মৌখিক স্বীকারোক্তি ও লক্ষণাদি দৃষ্টে ঈমান সম্পর্কে অনুমান করা যায়। সুতরাং মুসলমানগণকে এ বিষয়েরই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন ঃ মুহাজির নারীকে শপথ করানো হত যে, সে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণে আগমন করেনি, মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে আসেনি এবং অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের বশবর্তী হয়ে হিজরত করেনি বরং একান্তভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ভালবাসা ও সন্তুষ্টিলাভের জন্য আগমন করেছে। যে নারী এই শপথ করত, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মদীনায় বসবাসের অনুমতি দিতেন এবং সে তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা ইত্যাদি আদায় করেছিল, তা তার স্বামীকে ফেরত দিয়ে দিতেন।---(কুরতুবী)

তিরমিযীতে হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বলা হয়েছে ঃ নারীদের পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল সেই আনুগত্যের শপথ, যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ — মুহাজির নারীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে আয়াতে বর্ণিত বিষয়সমূহের শপথ করত। এটাও অসম্ভব নয় যে, প্রথমে তাদেরকে সেসব বাক্যও উচ্চারণ করানো হত, যেগুলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা) -এর রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে। এরপর আয়াতে বর্ণিত শপথ দ্বারা তা পূর্ণ করা হত।

فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ — অর্থাৎ পরীক্ষার পর যদি তারা মু'মিন প্রতিপন্ন হয়, তবে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠানো বৈধ নয়।

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ — অর্থাৎ এই নারীরা কাফির পুরুষদের জন্য হালাল নয় এবং কাফির পুরুষরা তাদের জন্য হালাল নয় যে, তাদেরকে পুনর্বিবাহ করবে।

এই আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, যে নারী কোন কাফিরের বিবাহাধীনে ছিল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেছে, তার বিবাহ কাফিরের সাথে আপনা-আপনি ভঙ্গ হয়ে গেছে, তারা একে অপরের জন্য হারাম। নারীদেরকে সন্ধির শর্ত থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত রাখার কারণ এটাই।

وَاٰتُوْهُمْ مَّا اَنْفَقُوْا — অর্থাৎ মুহাজির মুসলমান নারীর কাফির স্বামী বিবাহে

মোহরানা ইত্যাদি বাবদ যা ব্যয় করেছে, তা সবই তার স্বামীকে ফেরত দাও। কেননা, নারীকে ফেরত দেওয়াই কেবল সন্ধি-শর্তের ব্যতিক্রমভুক্ত ছিল, যা হারাম হওয়ার কারণে সম্ভবপর নয়, কিন্তু স্বামীর প্রদত্ত ধনসম্পদ শর্ত অনুযায়ী ফেরত দেওয়া উচিত। মুহাজির নারীকে সরাসরি এই ধনসম্পদ ফেরত দিতে বলা হয়নি বরং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ফেরত দাও। কারণ, স্বামী প্রদত্ত ধনসম্পদ খতম হয়ে যাওয়ার আশংকাই প্রবল। ফলে নারীদের কাছ থেকে ফেরত দেওয়ানো সম্ভবপর নয় বিধায় বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে। যদি বায়তুলমাল থেকে দেওয়া সম্ভবপর হয়, তবে সেখান থেকে নতুবা মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে দেওয়া হবে।— (কুরতুবী)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ — পূর্বের আয়াত থেকে বোঝা গেছে যে, মুহাজির মুসলমান নারীর বিবাহ তার কাফির স্বামীর সাথে ভঙ্গ হয়ে গেছে। এই আয়াতে তারই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখন মুসলমান পুরুষের সাথে তার বিবাহ হতে পারে; যদিও প্রাক্তন কাফির স্বামী জীবিত থাকে এবং তালাকও না দেয়।

কাফির পুরুষের স্ত্রী মুসলমান হয়ে গেলে তাদের পারস্পরিক বিবাহ বন্ধন যে ছিন্ন হয়ে যায়, এ কথা পূর্বের আয়াত থেকে জানা গেছে। কিন্তু অন্য একজন মুসলমানের সাথে তার বিবাহ কখন জায়েয হবে, এ সম্পর্কে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ আসল বিধি এই যে, যে কাফির পুরুষের স্ত্রী মুসলমান হয়, ইসলামী বিচারক তাকে ডেকে বলবে ঃ যদি তুমিও মুসলমান হয়ে যাও, তবে তোমাদের বিবাহ বহাল থাকবে নতুবা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এরপরও যদি সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তখন মুসলমান নারী কোন মুসলমান পুরুষকে বিবাহ করতে পারে। বলা বাহুল্য, ইসলামী রাষ্ট্রেই ইসলামী বিচারক কাফির স্বামীকে আদালতে হাযির করতে পারে। কাফির দেশে কিংবা শত্রুদেশে এরূপ ঘটনা ঘটলে সেখানে স্বামীকে ইস-লাম গ্রহণ করতে বলা সম্ভবপর নয়। ফলে বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা হতে পারবে না। তাই এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ তখন সম্পন্ন হবে, যখন মুসলমান নারী হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসে অথবা মুসলমানদের সেনা ছাউনিতে চলে আসে। উপরোক্ত ঘটনাবলীতে দারুল ইসলামের আসা মদীনায় পৌঁছার মাধ্যমে হতে পারে এবং সেনা ছাউনীতে আসা হুদায়বিয়ায় পৌঁছার মাধ্যমে হতে পারে। কারণ, তখন হুদায়-বিয়ায় মুসলিম বাহিনী অবস্থানরত ছিল। ফিকাহ্ বিদগণের পরিভাষায় একে 'ইখতিলাফে-দারাইন' বলা হয়েছে অর্থাৎ যখন কাফির পুরুষ ও তার মুসলমান স্ত্রীর মধ্যে দুই দেশের ব্যবধান হয়ে যায়—একজন কাফির দেশে ও অন্যজন মুসলিম দেশে থাকে, তখন তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে নারী অপরকে বিবাহ করার জন্য মুক্ত হয়ে যায়। —(হিদায়া)

আলোচ্য আয়াতে إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ বাক্যটি শর্তরূপে উল্লিখিত

হয়েছে অর্থাৎ তোমরা এই নারীদেরকে মোহরানা দিয়ে দেওয়ার শর্তে বিবাহ করতে পার। এটা প্রকৃতপক্ষে বিবাহের শর্ত নয়। কেননা, সবার মতেই বিবাহ মোহরানা আদায় করার উপর নির্ভরশীল নয়, তবে বিবাহের কারণে মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব অবশ্যই। এখানে একে শর্তরূপে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এই মাত্র এক মোহরানা কাফির স্বামীকে ফেরত দেওয়ানো হয়েছে। কাজেই বিবাহকারী মুসলমান মনে করতে পারে যে, নতুন মোহরানা দেওয়ার আর আবশ্যকতা নেই। এই ভ্রান্তি দূর করার জন্য বলা হয়েছে যে, বিগত মোহরানার সম্পর্ক বিগত বিবাহের সাথে ছিল। এটা নতুন বিবাহ; কাজেই এর জন্য নতুন মোহরানা অপরিহার্য।

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ—عصم শব্দটি عصمة-এর বহুবচন। এর আসল অর্থ সংরক্ষণ ও সংহতি। এখানে বিবাহ বন্ধন ইত্যাদি সংরক্ষণ যোগ্য বিষয় বোঝানো হয়েছে। كوافر শব্দটি كافرة-এর বহুবচন। এখানে মুশরিক রমণী বোঝানো হয়েছে। কেননা, কিতাবী কাফির রমণীকে বিবাহ করা কোরআনে সিদ্ধ রাখা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ পর্যন্ত মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ ছিল, তা খতম করে দেওয়া হল। এখন কোন মুসলমানের বিবাহ মুশরিক নারীর সাথে বৈধ নয়। পূর্বে যে বিবাহ হয়েছে, তাও খতম হয়ে গেছে। এখন কোন মুশরিক নারীকে বিবাহে আবদ্ধ রাখা হালাল নয়।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময় যে সাহাবীর বিবাহে কোন মুশরিক নারী ছিল, তিনি তাকে ছেড়ে দেন। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর বিবাহে দুইজন মুশরিক নারী ছিল। হিজরতের সময় তারা মক্কায় থেকে গিয়েছিল। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি তাদেরকে তালাক দিয়ে দেন।---(মাযহারী) এখানে তালাকের অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ করা। পারিভাষিক তালাকের এখানে প্রয়োজনই নেই। কেননা, আয়াতবলেই তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়।

وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا----অর্থাৎ যখন মুসলমান নারীকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হবে না এবং তার মোহরানা স্বামীকে ফেরত দেওয়া হবে, এমনিভাবে যদি কোন মুসলমান নারী ধর্মত্যাগী হয়ে মক্কায় চলে যায় অথবা পূর্ব থেকেই কাফির থাকার কারণে মুসলমান স্বামীর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুসলমান স্বামীকে তার মোহরানা ফেরত দেওয়া কাফিরদের দায়িত্ব হয়, তখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে এসব লেনদেনের মীমাংসা করে নেওয়া কর্তব্য। উভয় পক্ষ যে মোহরানা ইত্যাদি দিয়েছে তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী লেনদেন করে নেওয়া উচিত।

এই আদেশ মুসলমানগণ সানন্দে পালন করেছে। কারণ, কোরআনের আদেশ পালন করা তাদের কাছে ফরয। কাজেই যে যে নারী হিজরত করে এসেছিল, তাদের সবার মোহরানা ইত্যাদি কাফির স্বামীদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মক্কার

কাফিররা কোরআনে বিশ্বাস না থাকার কারণে এই আদেশ পালন করেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে পবরর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়।

عاقبتم—وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ الاية

শব্দটি معا قبة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রতিশোধ নেওয়াও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থও হতে পারে।---(কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই হবে যে, মুসলমানদের কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোক যদি কাফিরদের হাতে থেকে যায়, তবে তাদের মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ইত্যাদি ফেরত দেওয়া কাফিরদের জন্য জরুরী ছিল, যেমন, মুসলমানদের পক্ষ থেকে মুহাজির নারীদের কাফির স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাফিররা এরূপ করল না এবং মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দিল না। এখন তোমরা যদি এর প্রতিশোধ নাও এবং কাফিরদের প্রাপ্য মোহরানা তোমাদের প্রাপ্য পরিমাণে আটক কর, তবে এর বিধান এই যে, فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا اَنْفَقُوْا

অর্থাৎ তোমরা মুহাজির নারীদের দেয় আটককৃত মোহরানা থেকে সেই মুসলমান স্বামীদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণে দিয়ে দাও, যাদের স্ত্রী কাফিরদের হাতে রয়ে গেছে।

عا قبتم-এর অপর অর্থ যুদ্ধে সম্পদ হাসিল করাও হয়ে থাকে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যেসব মুসলমানের স্ত্রী কাফিরদের হাতে চলে গেছে এবং শর্ত অনুযায়ী কাফিররা মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা দেয়নি, এরপর মুসলমানেরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করেছে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকেই মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য দিতে হবে।---(কুরতুবী)

কিছু মুসলমান নারী ধর্মত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল কি? এই আয়াতে যে ব্যাপারে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, তার ঘটনা কারও কারও মতে মাত্র একটিই সংঘটিত হয়েছিল। তা এই যে, হযরত আয়ায ইবনে গানাম কোরায়শীর স্ত্রী উম্মুল হাকাম বিনতে আবূ সুফিয়ান ইসলাম ত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী সময়ে সে ফিরে এসেছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এছাড়া আরও পাঁচজন নারীর কথা উল্লেখ করেছেন, যারা হিজরতের সময়েই মক্কায় কাফিরদের সাথে থেকে গিয়েছিল এবং পূর্ব থেকেই কাফির ছিল। কোরআনের এই আয়াত নাযিল হওয়ার ফলে যখন মুসলমান পুরুষ ও কাফির নারীর বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়, তখনও তারা ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। ফলে তারাও সেই নারীদের মধ্যে গণ্য হয়, যাদের মোহরানা কাফিরদের কাছে মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য ছিল। কাফিররা যখন এই প্রাপ্য পরিশোধ করল না, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে পরিশোধ করে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, ধর্ম ত্যাগ করে মদীনা থেকে মক্কায় চলে যাওয়ার ঘটনা মাত্র একটিই ছিল। অবশিষ্ট পাঁচজন নারী পূর্ব থেকেই কাফির ছিল এবং কাফির থাকার কারণে আয়াতের ভিত্তিতে মুসলমানদের সাথে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। যে নারী ধর্ম ত্যাগ করে মক্কায় চলে গিয়েছিল, সেও পরবর্তীকালে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। ---(কুরতুবী) বগভী (র) বর্ণনা করেন যে, অবশিষ্ট পাঁচজনও পরে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল।---(মাযহারী)

নারীদের আনুগত্যের শপথঃ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ

يُبَايِعْنَكَ -এ আয়াতে মুসলমান নারীদের কাছ থেকে একটি বিস্তারিত আনুগত্যের শপথ নেওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ঈমান ও আকায়িদসহ শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করারও অঙ্গীকার রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াত দৃষ্টে যদিও এই শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষার পরিশিষ্ট হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার কারণে এটা শুধু তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়। বরং সব মুসলমান নারীর জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে শুধু মুহাজির নারীরাই নয়, অন্যান্য নারীরাও শপথ করেছে। সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত ওমায়মা বর্ণনা করেনঃ আমি আরও কয়েকজন মহিলাসহ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নে এবং সাথে সাথে এই বাক্যও উচ্চারণ করান فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاَطَقْتُنَّ. অর্থাৎ আমরা এসব বিষয় পালনের অঙ্গীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাধ্যে কুলায়। ওমায়মা এরপর বলেনঃ এ থেকে জানা গেল যে, আমাদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্নেহ মমতা আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশী ছিল। আমরা তো নিঃশর্ত অঙ্গীকারই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তযুক্ত অঙ্গীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারগ অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল হবে না।---(মাযহারী)

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) এই শপথ সম্পর্কে বলেনঃ মহিলাদের এই শপথ কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে হয়েছে ---হাতের উপর হাত রেখে শপথ হয়নি, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হত। বস্তুত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাত কখনও কোন গায়র মাহ্রাম নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি।---(মাযহারী)

হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এই শপথ কেবল হুদায়বিয়ার ঘটনার পরেই নয় বরং বারবার হয়েছে। এমনকি, মক্কা বিজয়ের দিনও রসূলুল্লাহ্ (সা) পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ সমাপ্ত করে সাফা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হযরত উমর (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বাক্যাবলী নিচে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন।

তখন যারা আনুগত্যের শপথ করেছিল, তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও ছিল। সে প্রথমে লজ্জাবশত নিজেকে গোপন রাখতে চেয়েছিল, এরপর শপথের কিছু বিবরণ জিজ্ঞাসা করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।---(মাযহারী)

পুরুষদের শপথ সংক্ষেপে এবং নারীদের শপথ বিশদরূপে হয়েছে ঃ পুরুষদের কাছ থেকে সাধারণত ইসলাম ও জিহাদের শপথ নেওয়া হয়েছে। এতে কার্যগত বিধি-বিধানের বিশদ বিবরণ ছিল না কিন্তু মহিলাদের শপথে তা ছিল। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, পুরুষদের কাছ থেকে ঈমান ও আনুগত্যের শপথ নেওয়ার মধ্যে এসব বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। নারীরা সাধারণত বুদ্ধি-বিবেচনায় পুরুষদের অপেক্ষা কম হয়ে থাকে। তাই বিস্তারিত বিবরণ সমীচীন মনে করা হয়েছে এবং নারীদের কাছ থেকে এই শপথ নেওয়ার সূচনা করা হয়েছে। এরপর পুরুষদের কাছ থেকেও এসব বিষয়েরই শপথ নেওয়ার কথা হাদীস থেকে জানা যায়।---(কুরতুবী) এ ছাড়া নারীদের কাছ থেকে যেসব বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে, নারীরা সাধারণত এসব বিষয়ে বিচ্যুতির শিকার হয়ে থাকে। এ কারণেও তাদের আনুগত্যের শপথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ—এতে প্রথম বিষয় হচ্ছে ঈমান অবলম্বন করা এবং শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সাধারণ পুরুষদের শপথেও থাকে। দ্বিতীয় বিষয় চুরি না করা। অনেক নারীই স্বামীর ধনসম্পদ চুরি করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। তাই এটা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বিষয় ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা। এতে নারীরা পাকাপোক্ত হলে পুরুষদের জন্যও আত্মরক্ষা করা সহজ হয়ে যায়। চতুর্থ বিষয় নিজ সন্তানকে হত্যা না করা।

মূর্খতা যুগে কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করার প্রচলন ছিল। আয়াতে একে রোধ করা হয়েছে। পঞ্চম বিষয় মিথ্যা অপবাদ ও কলংক আরোপ না করা। এই নিষেধাজ্ঞার সাথে এ কথাও আছে যে, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ — অর্থাৎ নিজের হাত ও পায়ের মাঝখানে যেন অপবাদ আরোপ না করে। এর কারণ এই যে, কিয়ামতের দিন মানুষের হস্তপদই তার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের পাপ কর্ম করার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আমি চারজন সাক্ষীর মাঝখানে এই কাজ করছি। এরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

এখানে স্বামীর প্রতি অথবা অন্য যে কারও প্রতি অপবাদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, কাফিরের প্রতিও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হারাম। এমতাবস্থায় স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা আরও বেশী কঠোর গোনাহ্ হবে। স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপের এক প্রকার এই যে, স্ত্রী অন্য কোন ব্যক্তির সন্তানকে স্বামীর সন্তানরূপে প্রকাশ করে এবং তার বংশভুক্ত করে দেয়। আরেক প্রকার এই যে, নাউযুবিল্লাহ্, ব্যভিচারের ফলে যে গর্ভ সঞ্চার হয়, তাকে স্বামীর সন্তান বলে চালিয়ে দেয়।

ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে একটি সাধারণ বিধি। তা এই যে وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ

অর্থাৎ তারা ভাল কাজে আপনার আদেশ অমান্য করবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) যে কোন কাজের আদেশ দেবেন, তা ভাল না হয়ে পারে না। এর ব্যতিক্রম নিশ্চিত অসম্ভব। এমতাবস্থায় 'ভাল কাজে' কথাটি যুক্ত করার কারণ কি? এর এক কারণ তো এই যে, মুসলমানরা যেন ভাল করে বুঝে নেয় যে, আল্লাহ্‌র আদেশের বিপরীতে কোন মানুষের আনুগত্য করা জায়েয নয়; এমনকি, সেই মানুষটি যদি রসূলও হন, তবুও নয়। তাই রসূলের আনুগত্যের সাথেও এই শর্তটি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, এখানে ব্যাপার নারীদের। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কোন আদেশেরই খেলাফ করবে না, এরূপ ব্যাপক আনুগত্যের কারণে শয়তান কারও মনে পথভ্রষ্টতার কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারত। এই পথ বন্ধ করার জন্য শর্তটি যুক্ত করা হয়েছে।